মানুষের সীমানা

দিবাকর ঘরের ভেতরে বসে বাইরের খোলা আকাশে সূর্যোদয় দেখছে।

এতদিন চারপাশে অসূয়া ঘিরে ছিল, ক্ষোভ জমে ছিল গভীরে, অনেকদিন তাই সূর্যালোক দ্যাখেনি, নিজের ঘরে নির্জিত ছিল দীর্ঘকাল। সহসাই কোথা থেকে উড়ে এসেছে তিনটি বাক্যে গাঁথা কথামালা। সাবধানবাণীর মত, তারপর উদ্বোধনে।

কথাটা কে বলল!

এই যে সামনে বসে আছে মুকুল, দিবাকরের স্ত্রী। তার পাশের চেয়ারে প্রভাস, একদা মুকুলের সহপাঠী, একটু আগে দিবাকরের সঙ্গে প্রভাসের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, এখন প্রভাস বসে আছে দিবাকরের মুখোমুখি। এদের মধ্যে কেউ কথাটা বলল! অথবা কেউ হয়ত বলেছিল কখনো। যারা মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আসে, যাদের সঙ্গে রাস্তায় পার্কে মাঠে দ্যাখা হয়ে যায়, যেমন অর্পিতা, মুকুল আসার আগে যার কথা সবসময় ভাবত, মুকুল আসার পরেও কখনো কখনো, যার কথা কোনোদিন মুকুলকে বলে নি অথচ না বলতে পারার জন্যে অপরাধবোধও না, কেন নয়, এটা ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে যায় দিবাকর। অর্পিতা এ বাড়িতে অনেকবার এসেছে, রাস্তায় পার্কে মাঠেও দ্যাখা হয়েছে, এরই মধ্যে হয়ত কোনো সময় কথাটা বলে থাকবে।

বিমানও হতে পারে। এ বাড়িতে বিমান কোনোদিন আসেনি কিন্তু এই বাড়ির কথা জানে। দিবাকরের মুখোমুখি হলেই কথার পিঠে কথা, কথার পিঠে কথা, কথার পিঠে—

ক্রমাগত একের পর এক বৃত্ত ঘিরে ফেলছে আমাদের। আমরা যখন বৃত্ত থেকে বেরোতে চাইছি, তুমি খুঁজছ উৎসভূমি!

বৃত্তের রহস্য জানতে চাই বিমান, তাই—

তুমি নিজেও রহস্য হয়ে উঠছ দিবাকর। তোমার রহস্যভূমিতে আমার আকর্ষণ নেই।

শেষবার বিমানের সঙ্গে কোথায় দ্যাখা হয়েছিল! ময়দানে, ঘোড়দৌড়ের মাঠের উল্টোদিকে অনেকক্ষণ বসে গল্প করেছিল ওরা। কথা বলতে বলতে হঠাৎ রিভলবার বার করে তারপর পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলেছিল, এটাই শেষ আশ্রয়। বৃত্তের ভেতরে কাউকে বিশ্বাস করি না, বৃত্ত আমায় জড়িয়ে পিষে ফেলছে। মুক্তি পেতে হলে,

শত্রুব্যূহের ভেতরে এই আমার একমাত্র বন্ধু। আগামীকাল আমি চলে যাচ্ছি দিবাকর।

কোথায় ?

জানি না।

ফিরছিস কবে ?

তাও জানি না। এরপর বিমান হারিয়ে গিয়েছিল।

কিংবা মনীশ। বিজ্ঞানের ছাত্র, তবু দর্শন ওর প্রিয় বিষয়। মনীশ অনেকবার দিবাকরের বাড়িতে এসেছে। ও এলে মুকুল খুশী হয়, নানা বিষয় আলোচনা করতে করতে ওরা ঝগড়া করে। দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে থাকে মনীশ, দর্শনের শরীর থেকে বিজ্ঞান কীভাবে নেমে এসে সাবালক হল, কেন অর্জন করল শুধু জেদ, লক্ষ্য-অভিমুখ নয়, কীভাবে বিজ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, মানুষকে বিপরীতমুখী করেছে,— এইসব আলোচনা করতে করতে প্রায়ই বলে ওঠে, নিজের সীমাবদ্ধতা যে জানে না বস্তুত খর্ব করে নিজেকে। সীমা জানা থাকলে তবেই অসীমের হদিস। ভাবনার জগতে বিজ্ঞান বামন বিশেষ, চওড়া হয়ে যাচ্ছে, লম্বায় বাড়ছে না।

মাঝে মাঝে ওরা তিনজন পারস্পরিক বাক্যবিনিময় করে এইরকম—

মনীশ— দর্শনের অবাধ্য সন্তান হল বিজ্ঞান।

মুকুল— তা হোক, তবু সত্য কথা বলে।

মনীশ — সত্য নয়, অহংকারের কথা বলে। অহংকার সত্যকে জানতে দেয় না।

দিবাকর— আমরা তো বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই জীবনযাপন করি।

মনীশ— তা করি কিন্তু খেয়াল রাখি না, সীমাবদ্ধতা ক্রমশ গ্রাস করছে আমাদের।

এইভাবে মনীশ বরাবর আমাদের চিন্তার বিপরীতে চলে যায়।

দীপংকরও কথাটা বলে থাকতে পারে। জব্বলপুর থাকার সময় অথবা দিল্লিতে যখন ছিল। এরপর নিউ জার্সীতে চলে গেছে, আর ফেরেনি। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। যখনই জায়গা বদল করে যেন একধাপ অতিক্রম করেছে। তার চিঠিতে প্রতিবার নতুন করে সীমা অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা, অতীতকে উপহাস, বর্তমানের সীমাবদ্ধতা, ভবিষ্যতে পৌঁছবার জন্যে এরা নেহাৎই উৎক্ষেপক কেন্দ্র ইত্যাদি। দিবাকরকে উদ্দেশ্য করে লেখে, তোরা কেবল বৃত্তের ভেতরে ঘুরপাক আর ঘুরপাক, কেন্দ্র খুঁজে পেলি না, স্পর্শকেরও খোঁজ করলি না। একদিন বেলুনের মত ফেঁসে যাবে বৃত্ত। এমন অকিঞ্চিৎকর জীবনের কথা ভাবলে দীপংকরের দুঃখ হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দীপংকরের চিঠিতে সবসময় না হলেও কখনো কখনো বিষণ্ণ হয়েছে দিবাকর। নিজের ঘরে নির্বাপিত থেকে বিষণ্ণতা গাঢ় হয়েছে। নিজের সীমাবদ্ধতা দিবাকর জানে। ঘরের কথা জানে, বৃত্তের কথাও জানে, ঘর যে সবসময় বৃত্তের কেন্দ্র থাকে না তা-ও জানে। দীপংকরের কথায় গাঢ়তা নেই, এসব জেনেও কখনো কখনো সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, কেন বিষণ্ণ হয় জানে না।

ধরা যাক, মুকুল বা প্রভাস এদের মধ্যে কেউ কথাটা বলল। অথবা অর্পিতা, বিমান, মনীশ বা দীপংকর এরা কেউ কোনো সূত্রে কথাটা বলেছিল। দিবাকর বুঝতে পারছে, কথাটা ক্রমে গাঢ় হয়ে তাকে উদ্বোধিত করেছে, সে নির্জিত ঘরে নেই, সূর্যোদয় দ্যাখার কথা ভেবেছে, এমন কি ঘর উন্মুক্ত করে সূর্যোদয় দেখছে এখন।

হয়ত বা এমন ঘটেছে, কারো খেয়ালে গুজব রটনা হয়েছিল, পরম্পরায় প্রসারিত হয়ে প্রবাদে পরিণত, প্রবাদ চলমান হয়ে, যেমন ঘড়ির দোলক, নিত্য দোলনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আঘাত করে শব্দ উৎপন্ন করে, মানুষের মনে সময়-চেতনা উদ্বোধিত করে। এই প্রবাদও নির্দিষ্ট সময়ে দিবাকরের মনে আঘাত করে তাকে উদ্বোধিত করছে, নির্জিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে।

অবশ্য এই সূত্রগুলি নির্দিষ্ট হয়ে দিবাকরের সামনে উপস্থিত হতে পারেনি। সে এখনো গভীর সংশয়ের ভেতরে। সম্ভবত কোনোটাই এককভাবে স্পষ্ট কারণ নয়, তার মনে ওদের যৌথ উদ্যোগ এই কথামালা জাগিয়ে দিয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে এতদিন পরে প্রভাসের এই বাড়িতে আসা, প্রভাসকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া, এটা কোনো তাৎপর্য বহন করছে! এত বছর দাম্পত্যজীবনের পর কেন এখন পুরনো স্মৃতি নিয়ে প্রভাসের হঠাৎ বৃত্তে ঢুকে পড়া, সংসার বৃত্তের বাইরে থেকে প্রভাস এসেছে কিন্তু মুকুলের প্রত্যয় এমন যেন এই বৃত্তের ওপর কোনো অভিঘাতই নয়, দিবাকর নিঃসংশয় হতে পারেনি। তার মধ্যে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় কি সহসা এই কথামালা!

বিমান এ বাড়িতে আসবে না, এটা স্বাভাবিক। সে বৃত্তের সীমা জেনেছে, অতিক্রম করার জন্য ওর মরণপণ সংগ্রাম। ওর বিপরীতে দিবাকর সীমা অতিক্রম করতে চায় না, কেন্দ্রে উৎসভূমি খুঁজছে অতএব এই বিপরীত দিবাকরকে বিমান অবজ্ঞা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মনীশ কী বোঝাতে চায়! মুকুল ওর কথা মন দিয়ে শোনে, ঝগড়া করে, ঝগড়া করে আনন্দ পায়, মনীশের প্রতি না হলেও মনীশের কথার প্রতি মুকুল অবশ্যই আকর্ষণ বোধ করে। মনীশ বলতে চায়, বিজ্ঞান পৌনঃপুনিক, বৃত্তময়। কিন্তু বিজ্ঞান তো পৌনঃপুনিক নয়, অভিমুখ আছে, বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া আছে। মনীশ অবশ্য বলে, এটা সর্পিল পৌনঃপুনিকতা। মনীশ আরো বলে, বিজ্ঞানের ধারণা, সত্যকে ও জানবে কিন্তু বেচারা জানে না, ঠিক ঠিক দেখতে পায় না, ঠিক ঠিক শুনতেও পায় না। বরং যদি কল্পনা করতে পারত, বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া থাকলে বুঝত, কল্পনার ভেতরেই সত্য জেগে থাকে।

দিবাকর ও মুকুল দুজনেরই মনে হয়েছে, মনীশ অন্য কিছু বোঝাতে চায়। আসলে ওদের এই জীবন, দাম্পত্য, এই স্বাভাবিকতাকে ও আঘাত করে। ওর কথাবার্তা, ঝগড়া, মুকুলের সঙ্গে চাপান উতোর, এসবও বৃত্তময় তা ও জানে না? হয়ত বৃত্তময় জীবনের ওপর বৃত্তময় অভিঘাত, সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ওদের যদি নিয়ে যেতে পারে, মনীশের ভাষায়, সত্য তার আশ্রয়ে যাবার জন্যে উদ্যত। এই ভাষা কি ওদের

দাম্পত্যের প্রতি কোনো সংকেত বহন করে আনছে !

অর্পিতা মাঝেমাঝেই কেন বাড়িতে সরাসরি চলে আসে, দিবাকরের সন্দেহ হয়। ইতিহাস নিয়ে দিবাকরের চর্চা আছে, ইতিহাস বিষয়ে অর্পিতারও গভীর উৎসাহ, নানা কৌতূহল নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে। মুকুলের সঙ্গে ভাব জমায়, জোর করে চা খায়, মাঝে মাঝে মিষ্টি, চ্যানাচুর নিয়ে আসে। মুকুল তবু অন্তরঙ্গ হয় না, খারাপ ব্যবহারও করে না, দূরত্ব রাখে বোঝা যায়। অর্পিতার আচরণে প্রগলভতা থাকলেও স্বাতন্ত্র বজায় রাখে। সব মিলিয়ে ভারসাম্য থাকে তবু বোঝা যায় অর্পিতা ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র আঁটছে। মুকুলকে হয়ত উসকে দিতে চায়, সংসারের সীমারেখার ভেতরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়ে, দুজনকেই নাড়িয়ে দিয়ে, আবার দুজনকে মুখোমুখি করে, দিবাকর স্পষ্টই বুঝতে পারে অর্পিতা কিছু একটা বলছে কিন্তু নির্দিষ্ট উচ্চারণে কখনো সেই বলা জেগে ওঠে না।

অথচ নিয়মিত উচ্চারণে দীপংকর স্মরণ করিয়ে দেয় দিবাকরের সীমাবদ্ধতার কথা। দিবাকরের আকাশ ছোট হয়, অন্তর্বর্তী এবং তার সীমারেখায় কোনো সম্পর্ক থাকে না, ওদের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। তবু এটা ঘটনা, এমন নিরেট উচ্চারণ, এমন পরম্পরাহীন বাক্য আর কেউ উচ্চারণ করেনি যা স্থায়ীভাবে না হলেও চকিতে তার মর্মমূল বিদ্ধ করেছে কখনো কখনো।

এইসব চরিত্র, চরিত্র পরম্পরায় নানা ঘটনা, ঘটনারা কখনো স্মৃতি, কখনো ঘটমান, কখনো বা কল্পনা, ক্রমে পরিণত বিচিত্র আবহে। সেখানে খচিত অসহ্য ইঙ্গিত, ব্যাপ্ত গভীর আশংকা, মধ্যবর্তী কুয়াশায় অসংখ্য অসুয়া, কতকাল সূর্যোদয় দ্যাখেনি দিবাকর। এমন অন্ধ সময়ে গভীরে গড়ে উঠতে থাকা প্রবাদবাক্যটি অথবা কারো কথায় বা ইঙ্গিতে জেগে উঠে গাঢ়তা পেয়েছে সেই বাণী, ভেসে এসেছে বহুদূরে থেকে,— তোমার ঘর তোমার কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে ফেলেছে বৃত্ত, যে রজ্জুতে বাঁধা পড়ছ দিবাকর, তোমাকে গ্রাস করছে। জেগে ওঠ, অতিক্রমী হও।

তাই জেগে উঠছে সে, সূর্যোদয় দেখবে বলে। দিবাকর লক্ষ্য করেছে, বাণীর ভেতরে দুটি মূল শব্দ— রজ্জু ও বৃত্ত। অতএব রজ্জুর তথ্য ও তত্ত্বে তাকে মনোনিবেশ করতে হচ্ছে।

জানালাগুলো খুলে দিতে এই যে সূর্যকিরণে উজ্জ্বল চতুর্দিক, বৃত হয়েছে সবকিছু, এরা কি সূর্যকিরণে বাঁধা পড়েছে ! সূর্য থেকে নির্গত রশ্মিগুচ্ছ বিকিরণে একটা পথ, পৃথিবীকে ছুঁয়ে বলয়ের মত ঘিরে ধরেছে, সূর্যরশ্মিই তবে রজ্জু ! কিন্তু গ্রাস করেছে পৃথিবীর সবকিছু, শুধুমাত্র দিবাকর, তার কেন্দ্রবিন্দু ঘর নয়। সূর্যরশ্মি কোনো বিভ্রমও নয়, তাকে অতিক্রম করার প্রশ্ন ওঠে না কেননা সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাজাগতিক কোনো অবস্থানে দিবাকরের যাওয়া, অথবা সেখান থেকে কোনো বাণী ছিটকে এসে এখানে, কিংবা এখানেই গড়ে ওঠা কোনো প্রবাদ তার সীমা অতিক্রম করে

অতটা দূরবর্তী, দিবাকর কোনো কিছুতেই নির্দিষ্ট হতে পারছে না।

রজ্জু সম্পর্কে কিছু তথ্য ও তত্ত্ব তার জানা আছে। রজ্জু দুরকম। উদ্ভিজ্জ ও খনিজ। দৃশ্যময়তা থেকে যুক্তি ও বিশ্লেষণে, তারপর বোধের অনুশীলনে এবং কখনো কখনো স্বপ্ন সম্মোহনে নির্ভর করে দিবাকর সিদ্ধান্তে আসে যে, মানুষ ও উদ্ভিদ পারস্পরিক সহযোগিতায়, নির্ভরতায় একে অপরকে আচ্ছন্ন করে আছে। মানুষ অপেক্ষাকৃত হীন কিন্তু উদ্ভিদ মাতৃসমা। মানুষ অবহেলায়, কদাচিৎ যত্নে তার প্রতি বর্জ্য নিক্ষেপ করলেও প্রতিদানে উদ্ভিদ তাকে দেয় তার সুস্বাদু প্রজন্ম, সুবাতাস, সবুজ স্নেহ, গাঢ় আচ্ছাদন। মানুষের চারপাশে এই নিবিড়তা মানুষ বুঝতে পারে না, কেননা তার অহংকার চোখ ঢেকে রাখে, এই উদ্ভিজ্জ রজ্জুর কথা মানুষ তাই জানতে পারে না। দিবাকরের এই সহসা অনুভব তাকে চিনিয়ে দিল রৌদ্রে স্নান করতে থাকা চারপাশের বনস্থলী, দীর্ঘাঙ্গ সন্ন্যাসী বৃক্ষরাজি, স্রোতস্বিনীর মত বহমান ঊর্মিমুখর শস্যকণা। দিবাকর ভাবল, এই যদি প্রবাদকথিত রজ্জু, যদি দিবাকরকে গ্রাস করছে, অতিক্রমের কথা ওঠে কেন! অতিক্রমী হলে যে ঊষর প্রান্তর, দিকচিহ্নহীন মরুভূমি, তা কি সহনীয়, কখনো প্রার্থিত হতে পারে!

অবশ্য খনিজ রজ্জুর সঙ্গে এমন সহবৎ গড়ে ওঠে না, দিবাকর জানে। পৃথিবীর জঠরেই নিহিত থাকে। মানুষ আগ্রাসী হলে, পৃথিবীর জঠর উৎপাটিত করতে চাইলে কী করা যাবে! যাদের ব্যবহার করতে চাইল মানুষ, ব্যবহৃত হতে হতে মানুষকে অভ্যস্ত করতে করতে তাকেই গ্রাস করতে উদ্যত এখন। এই খনিজ রজ্জুর বেষ্টনী অনুভব করছে দিবাকর, একে অতিক্রম করতে হয়ত পারবে সে, বরং খনিজ রজ্জুর চেয়ে উদ্ভিজ্জ রজ্জুর কাছে আত্মসমর্পণ ভালো, যে স্নেহ মোক্ষণ করবে, খনিজের মত হৃদয়চর্বণ করবে না। অবশেষে খনিজ রজ্জুর অস্তিত্ব গাঢ় অনুভবের ভেতরে এনে, তার নিঃস্পন্দ প্রাণকে উপেক্ষা করে উৎক্রামী হতে পারল।

বরং মানব-সম্পর্ক ও মানব-পরম্পরায় নিজেকে বেশি গ্রস্ত বোধ হচ্ছে। এই সম্পর্ক উদ্ভিজ্জের মত সহনশীল নয়, বরং প্রতিযোগী, ঈর্ষাসঞ্চারী। এই ঘরের ভেতরে এতকাল সূর্যালোকহীন দিবাকর, এখন উন্মুক্তির সামনে, স্পষ্ট অনুভব করছে, তাকে কেন্দ্র করে, তার এই ঘর উপেক্ষা করে মানব-বেষ্টনী সাজানো আছে। মুকুল, মুকুলের এপাশে প্রভাস। তাদের পেছনে বৃত্তাকারে বিমান, মনীশ, দীপংকর, অর্পিতা। তাদের পেছনে আরো অস্পষ্ট বৃত্তাকারে সুশৃংখল মানব-বেষ্টনী বৃত্তের পর বৃত্তে সাজানো। এদের অতিক্রম করে কীভাবে যাবে দিবাকর! খনিজ বা উদ্ভিজ্জ রজ্জুগুলি অতিক্রম করা না-করায় কিছু এসে যায় না, এদের ভেতরে এদের নিয়েই ওতোপ্রোত হয়ে আছে। কিন্তু মানব-রজ্জুতে গ্রস্ত দিবাকর থমকে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যবর্তী এই ঘরের কেন্দ্রবিন্দুতে।

মানব-রজ্জুর কেন্দ্রস্থলে গ্রস্ত দিবাকর, তার একাকীত্ব, সেখানে মুকুল থাকে না।

কখনো কখনো সেখানে ঢুকে পড়ে, একাকীত্ব থেকে মুক্তি দেয়। বন্ধনের ভেতরেও এই সহযোগ, দিবাকর সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারে। এই যে বিছানায় শুয়ে আছে মুকুল, কখন থেকে শুয়ে আছে! প্রভাস কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে, এই অবকাশে জানালা খোলার উন্মুক্তি, সূর্যোদয় দেখতে থাকা, এর মাঝামাঝি কোনো এক সময় মুকুল ঘুমিয়েছে। প্রবাদকথিত রজ্জুর বস্তুগত অবস্থান চিনে নেয়া যখন একান্ত জরুরি, সহযোগী যখন একমাত্র মুকুল, এই সময় তার এভাবে ঘুমিয়ে থাকার কী অর্থ হতে পারে! মুকুলকে এখন দরকার, এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎক্রামী হতে হবে, সেই বহু কথিত বাণী অনুসরণ করে রজ্জুর সন্ধানে, যা ক্রমশ গ্রাস করছে তাকে। অতএব সূর্যকিরণ থাকতে থাকতেই রজ্জুর বেষ্টনী অতিক্রম করে যেতে হবে।

মুকুলকে দু-একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে তার শরীর নাড়িয়ে দিল। মুকুল চমকে উঠে বসল, কী হয়েছে!

চল বেরিয়ে পড়ি।

কোথায়!

আপাতত ঘরের বাইরে।

তারপর?

বৃত্তরজ্জুর দিকে।

বৃত্তরজ্জু!

যা আমাদের গ্রস্ত করছে, কে যেন বলল, অথবা কেউ বলেছিল, কিংবা সেই প্রবাদ-কথিত সাবধানবাণী। অতিক্রম করে যেতে হবে, আমরা আর দেরী করতে পারি না।

অতিক্রম করে কোথায় যাব?

জানি না, আপাতত ঘরের বাইরে।

মুকুল দিবাকরের সহযোগী, দুজনে একসঙ্গে ঘরের বাইরে গেল।

কেন্দ্রের বাইরে এসে সবকিছু বদলে গেছে। সূর্যালোকে ম্লান ছায়া! পেছন ফিরে দেখল দিবাকর, চারপাশে ছড়ানো অসংখ্য কেন্দ্রের ভেতরে নিজের কেন্দ্র খুঁজে পাচ্ছে না। দিবাকর নিজেও বদলে গেছে। গম্ভীর মুকুল কিছু ভাবছে।

কী ভাবছ মুকুল?

এখনই আলো ম্লান হল কেন?

ছড়ানো এত কেন্দ্রের ভেতরে আমাদের কেন্দ্র কোথায়?

আমি চিনতে পারছি।

আমি পারছি না কেন?

আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

ঐ দ্যাখ মুকুল, ঐ যে—

দিবাকর দেখছে, অসংখ্য কেন্দ্রবিন্দুগুলি সংহত হচ্ছে, চারিদিকে বৃত্তাকারে গড়ে

উঠছে পরিধি। বিচিত্র গড়নে পাক খেতে খেতে রজ্জু ঘিরে আছে বৃত্তাকারে। খনিজ, উদ্ভিজ্জ, মানবসূত্রে গঠিত এই রজ্জু দেখতে দেখতে, দিবাকরের পা নড়ে যাচ্ছে, আশ্চর্য প্রবতায় ভেসে উঠেছে সে, ভেসে থাকছে। তার হাত ধরতে গিয়ে বারবার পিছলে যাচ্ছে মুকুলের হাত। দিবাকর ওকে ধরে তুলতে চাইছে, বারবার ডুবে যাচ্ছে মুকুল।

কী হল মুকুল, উঠে এস। আমরা সাঁতার কেটে রজ্জুর দিকে যাব।

পারছি না দিবাকর। চল আমরা ঘরে ফিরে যাই।

আমরা বেরিয়েছি অতিক্রম করার জন্যে, ফিরে যাবার কথা বলছ কেন!

অতিক্রম করে গেলে আর ফিরতে পারব না। দেখছ না, সূর্য ডুবে যাচ্ছে, সূর্যাস্তকে সূর্যোদয় ভেবে ভুল করেছি। এখনো সময় আছে।

তাই তো!

অবাক হয়ে আছে দিবাকর। আকাশে অলৌকিক আলো, তার মধ্যে একাকী পিঙ্গলবর্ণে সজ্জিত, দাঁড়িয়ে আছে সে। কখন যেন মুকুল হারিয়ে গেছে। চারপাশে কেউ নেই, কেন্দ্রগুলি মুছে গেছে। একাকী এই অলৌকিক মহিমা নিয়ে কেন দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর!

ক্রমে আকাশের অলৌকিক আলো, পিঙ্গলবর্ণ ঝরে যাচ্ছে, অদৃশ্য হচ্ছে পৃথিবীর ভূমিগত বন্ধন। চারপাশে ছড়ানো আছে পাকে পাকে জড়ানো রজ্জু। উজ্জ্বল, ঘূর্ণ্যমান রজ্জু। কখনো উদ্ভিদ, বয়ে যাচ্ছে শস্যশ্যামল, আদিম বনস্থলী, পাহাড় ঘেরা অরণ্যসোপান। কখনো খনিজ, তুলে আনছে প্রাগৈতিহাসিক, ভাস্কর্য স্থাপত্য, সভ্যতার উজ্জ্বল বর্ণমালা। কখনো মানব-সংকুল জনপদ, দীপংকরের হাত তুলে রাখা, অর্পিতার চোখ, প্রভাসের চকিত মুখ, মনীশের দুহাত ছড়িয়ে রাখা, মুকুলের অবিরাম সাঁতার কাটা। ঘূর্ণ্যমান রজ্জু কখনো জ্বলে উঠছে, কখনো হারিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীভূত দিবাকর, তার সামনে একমাত্র অস্তি এখন পৃথিবীর দিগন্ত ব্যেপে অলৌকিক রজ্জুর ক্রমাগত ঘুরে যাওয়া।

কী করবে দিবাকর! এই যে ক্রমাগত পরিধি ছোট হয়ে আসছে, রজ্জুর কাছে ন্যস্ত হয়ে যাবে কিংবা ঋজু পদপাতে অতিক্রম করবে তাকে?

সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, দৃঢ় পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সে, এগিয়ে আসছে তার মুখোমুখি অদ্ভুতবর্ণ ঐ রজ্জুর ঘোরাটোপ। দিবাকর শুনছে, অর্পিতা দীপংকরদের ব্যাকুল আশ্বাস, দেখতে পাচ্ছে দীর্ঘায়িত বনস্থলীর সুদূর হাতছানি, তার স্বাদের ভেতরে উন্নত সভ্যতার বর্ণময় ভ্রূবিলাস। রজ্জুর ওপারে সমস্ত রঙ, সমস্ত আলো জমা হচ্ছে। সূর্যোদয় তবে ওখানে!

দিবাকর কোথায় এখন! সর্বদিক সর্বশূন্য। রজ্জুর চিহ্ন নেই, আলো নেই, রঙ নেই। সে কি অতিক্রম করেছে সব, অলৌকিক রজ্জু, ভূমণ্ডল, যাবতীয় রঙ, আলো। কী এখানে! দিবাকর, সর্বস্ব শূধু দিবাকর। কোথাও দর্পণ নেই। □